ঋগ্বেদ-সংহিতা

ঋগ্বেদ সংহিতা

বঙ্গানুবাদ-রমেশ চন্দ্রদত্ত

ভূমিকা

ঋগ্বেদ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র—শশিভূষণ দাশগুপ্ত
রমেশচন্দ্রের রচনাবলী— প্রবোধরাম চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ— যামিনী রায়

বৈদিক সাহিত্যের সাধারণ পরিচিতি সহ
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও
মনি চক্রবর্তী
কর্তৃক সম্পাদিত

তথাগত
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড ।। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ-৯৮৩০১৮৮৭২৪/(০৩৩) ২৩৫১ ৪৩৭৮

Rik-Veda
Translated by Ramash Chandra Dutta

প্রকাশক
অপর্ণা বসাক

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩
তথাগত থেকে পুনর্মুদ্রণ ২০১৮

ISBN: 978-93-87603-06

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস
৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রাপ্তিস্থান
মহেশ, সায়ন, দে'জ (কলেজ স্ট্রিট)

মূল্য ৮০০ টাকা

সূচিপত্র

ঋগ্বেদ-সংহিতা ঃ রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ

প্রসঙ্গকথা

বাংলা তথা ভারতের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতিসর্ববিষয়ে পারদর্শী যেসব মনীষী দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, যাঁদের গৌরবগাথা স্মরণ করে পরবর্তী প্রজন্ম শ্লাঘা বোধ করে রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁদেরই অন্যতম।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরির তৎকালীন সম্পাদক গৌরহরি সেনকে লেখা এক চিঠিতে (১৬ পৌষ, ১৩১৬) রমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, তাই তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন— ''তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্য্যে, কি দেশহিতে সর্ব্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে— বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ।.... আমাদের দেশে তাঁহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

কলকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবারের ১৮৪৮-এর ১৩ আগস্ট, কৃষ্ণ সিংহের গলির (বর্তমানে বেথুন রো) মামাবাড়িতে রমেশচন্দ্রের জন্ম। বাবা ঈশানচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। সরকারি ভাবে তাঁকে দেশ-দেশান্তরে যেতে হত। বাল্যাবস্থায় রমেশচন্দ্রও তাঁর বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন নানা জায়গায়; বারবার স্থান পরিবর্তনে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় ব্যাঘাতের কথা ভেবে ঈশানচন্দ্র পরিবারবর্গকে কলকাতায় রেখে দেওয়াই মনস্থ করেন। রমেশচন্দ্র কলকাতায় এসে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন (পরবর্তীকালে হেয়ার স্কুলে)। এর অল্প কিছুদিন বাদেই মা থাকমণি দেবীর মৃত্যু হয় (১৮৫৯)। এই ঘটনার দু-বছর বাদে বাবাও মারা যান (১৮৬১)। অল্পবয়সেই মা-বাবাকে হারানো বালক রমেশচন্দ্র, কাকা শশীচন্দ্রর তত্ত্বাবধানে বড়ো হন। এই কাকা ছিলেন সেকালের একজন খ্যাতনামা ইংরেজি লেখক।

এনট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়ই মাত্র ১৬ বছর বয়সে (১৮৬৪) তাঁর বিবাহ হয়; পাত্রী মাতঙ্গিনীদেবী ছিলেন সিমুলিয়া নিবাসী নবগোপাল বসুর মেজো মেয়ে।

১৮৬৪-তে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে ১৮৬৬-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই কলেজে চতুর্থ বার্ষিকীতে অধ্যয়ন করার সময় রমেশচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেতে যাওয়া মনস্থ করেন। তাঁর পিতামহ বিলাতযাত্রার বিরোধী, কারণ তখনকার দিনে এটা ছিল সামাজিক অপরাধ। যাই হোক শেষ পর্যন্ত দাদা যোগেশচন্দ্রের সহায়তায় গোপনে রমেশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (১৮৭১) তিনি দ্বিতীয় স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হন। ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতেও (১৮৭১) তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭১-এর সেপ্টেম্বরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেই সরকারি কাজে যোগ দেন চব্বিশ পরগনার অ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবে (২৮ সেপ্টে. ১৮৭১)।

তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার ১৮৯২-তে তাঁকে সি.আই.ই উপাধিদান ও তার তিন বৎসর পরে বেঙ্গল

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য পদে মনোনীত। বাঙালির মধ্যে রমেশচন্দ্রই সর্বপ্রথম কমিশনারের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ রাজপদ লাভ করেছিলেন।

১৮৯৭-তে ১০ মাসের ছুটি নিয়ে রমেশচন্দ্র বিলাতযাত্রা করেন। প্রধানত ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনের জন্য বিলেতে আন্দোলন পরিচালনাই ছিল এই যাত্রার উদ্দেশ্য।

১৯০০-এ তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই উপলক্ষে তাঁকে কলকাতায় বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

১৯০৪-তে তিনি বরোদা রাজ্যের রাজস্ব সচিব পদে যোগ দেন। পরবর্তীকালে ওই রাজ্যের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হন (১৯০৯)। যদিও ওই বছরই তিনি বরোদাতে পরলোক গমন করেন।

বিশ্ব-বাঙালির অহংকার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি (১৮৯৪) রমেশচন্দ্র মাত্র দেড় বছর পরিষদের সভাপতি থাকার পর রাজকার্য উপলক্ষে তাঁকে উড়িষ্যা চলে যেতে হয় ও পরিষদের সভাপতিত্ব ত্যাগ করতে হয়; কিন্তু তিনি এই অল্প সময়েই পরিষদকে যে ছাঁচে ঢেলে দিয়েছিলেন পরিষদ আজও প্রায় তেমনই ভাবে চলছে।

শুধু রাজকার্য ও সামাজিক কার্যেই সাফল্য নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, এই দুই প্রদীপ্ত প্রতিভার মাঝে পড়ে রমেশচন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক দীপ্তিতে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিভাত হতে পারেননি ঠিকই কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ দেখা যায়। মধুসূদনের মতো রমেশচন্দ্রের প্রাথমিক রচনাগুলিও ইংরাজিতে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র-ই তাঁকে বাংলা ভাষায় লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

ভারতীয় সভ্যতা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৮৫-৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন **'ঋগ্বেদ সংহিতা'**, মূল সংস্কৃত (প্রথমোদৃষ্টকঃ) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন ১২৯২ (ইং ১৮৮৫)-তে। ৭৬৪ পৃষ্ঠার এই বিপুলায়তন গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ (১ম-৮ম অষ্টক) প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ১৮৮৫-৮৭ খি:-তে।

বর্তমান গ্রন্থটি সেই অমূল্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের আধুনিক মুদ্রণ।

আজ যখন ধর্মের নামে, ভারতীয় সংস্কৃতির নামে মিথ্যাচারের বণ্যা বয়ে যাচ্ছে, তখন মূল গ্রন্থের কাছে ফিরে যাওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে আমাদের মনে রয়েছে। এই গ্রন্থ তাই শিকড়ের সন্ধানে অমৃতযাত্রা। পাঠকের ভালো লাগলে আমাদেরও ভালো লাগবে। অলমতি বিস্তরেণ।

প্রকাশক,
তথাগত

ঋগ্‌বেদ   সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধে ভারতের প্রবীণ রাজনীতিক নেতা শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী বলিয়াছেন যে,

Sanskrit is the symbol of our seniority among the nations of the world—

পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমাদের প্রাবীণ্যের বা শ্রেষ্ঠতার প্রতীক হইতেছে সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং ভারতের ধর্মচিন্তার ও সভ্যতার উৎসস্বরূপ হইতেছে 'ঋগ্‌বেদ'।

প্রাচীনত্বে, এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মর্য্যাদায়, পৃথিবীর পাঁচ-ছয়খানি গ্রন্থের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সর্বপ্রাচীন। মানবজাতির ইতিহাসে, ঋগ্‌বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি লুপ্ত হইয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে মিসর, মেসোপোতামিয়া (ইরাক্—সুমের ও আক্কাদ) ও এশিয়া-মাইনর এবং সিরিয়া দেশের নানা জাতির মানুষ, ভারতবর্ষে আর্য্য সভ্যতার পত্তন, গঠন ও বিকাশের বহু পূর্বে, সভ্য জীবন-ধারা গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিজ-নিজ ধর্ম ও ধার্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং সেই জীবন-ধারা ও ধর্মের প্রকাশক কতকগুলি বিশেষ লক্ষণীয় সাহিত্য-সর্জনাও তাহাদের দ্বারা ঘটিয়াছিল। কাল-ক্রমে ঐ-সমস্ত দেশে, নানা বিদেশী বিজেতার প্রভাবে সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক জীবনে পরিবর্তন আসিয়া যায়, ভাষায় বিপর্য্যয় আসিয়া পড়ে, এবং বহু ক্ষেত্রে জাতির মানুষ বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ভাষা লোপ পায় অথবা আমূল পরিবর্তিত হয়, এবং ভাষার প্রাচীন লিপির জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু বিগত উনবিংশ শতকে ও এই বিংশ শতকে, প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপের নানা দেশের ঐতিহাসিক, প্রত্নবিৎ, বাকৃতত্ত্ববিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের চেষ্টার ফলে, পাথরে, মাটির ফলকে, ধাতুফলকে, পাপিরস্ কাগজে বা চামড়ার কাগজে উৎকীর্ণ বা মুদ্রিত অথবা লিখিত এই-সমস্ত বিলুপ্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যের পাঠোদ্ধার হয়, এবং মানবের ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত, গ্রীক, হিব্রু, চীনা প্রভৃতি প্রাচান ভাষায় উপলব্ধ ও জনসমাজে পঠিত ও সুপরিচিত সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী কতকগুলি অজ্ঞাতপূর্ব বিরাট্ প্রাচীন সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠির উদ্ধার ঘটে। এই-সমস্ত লুপ্ত সুপ্রাচীন সাহিত্যিক রচনার পুনরাবিষ্কারের ফলে জানা যায় যে, সর্বজনমান্য ধর্মগ্রন্থের পদে প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর প্রাচীনতম কতকগুলি গ্রন্থকে আর সর্বপ্রাচীন বলা যায় না—তাহাদের চেয়ে আরও পুরাতন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ঋগ্‌বেদ ও অন্য বেদ, প্রাচীন গ্রীসের Homer হোমর রচিত মহাকাব্যদ্বয় *Iliad* ইলিয়াড ও *Odyssey* ওডিসি, প্রাচীন ঈরানের *Avesta* অবেস্তা, চীনের *Shi-King* শী-কিঙ্ (বা *Shih-Ching* শ্‌ঃ-চিঙ), *Shu-King* শু-কিঙ্ ও *I-King* ঈ-কিঙ্, য়হুদীদের প্রাচীন গ্রন্থ *Thorah* থোরাহ্ (হিব্রু ধর্ম-পুস্তকের প্রাচীনতম অংশ) প্রভৃতি গ্রন্থের পিছনে, আরও প্রাচীন কতকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয় ও অন্যবিধ গ্রন্থ এখন পাওয়া গেলেও, এবং বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমহলে সেগুলির পঠন-পাঠন ও আলোচনা রীতিমত-ভাবে আরম্ভ হইয়া গেলেও, প্রাচীন পুস্তকগুলির (ঋগ্‌বেদ, হোমর, শী-কিঙ্, থোরাহ্ প্রভৃতির) প্রতিষ্ঠা কমে নাই—গত